শুক্রবার, ২৭ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৩৫

মার্কিনি খামখেয়ালিপনায় বিশ্বজুড়ে তেলের সংকট তৈরি হবে

দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরেই ডোনাল্ড ট্রাম্প পরপর যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে এইচ-১বি ভিসা স্পাউস অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বাতিলের ফলে সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ভারতীয়রা। এবার ইরানের সঙ্গে আণবিক চুক্তি বাতিল করে বিশ্বজুড়ে তিনি নতুন সংকটের সৃষ্টি করলেন। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম ইতিমধ্যেই বেড়েছে। আগামী দিনে আরও বাড়ার আশঙ্কা। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে ইরানের সঙ্গে যে আণবিক চুক্তি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, তিনি ওই চুক্তি থেকে বেরিয়ে এলেন। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দামে প্রভাব পড়ল। বুধবার বিশ্ববাজারে দুই শতাংশ তেলের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি সারা বিশ্বে তেলের সংকট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আশ্বাস দিয়েছেন, ভারতের তেল আমদানির ওপর এখনই এর কোনও প্রভাব পড়বে না। কিন্তু তিনি এ কথা বললেও আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা, ইরানের সঙ্গে আণবিক চুক্তির থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে এলে তেল আমদানি কার্যত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এর কড়া সমালোচনা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিনি আবার ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন। ইতিমধ্যেই তেল রফতানি কারক দেশ সংস্থাগুলির আশঙ্কা, এর ফলে তেলের দাম নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। অর্থাৎ পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়তে পারে। তবে একটি মহল থেকে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে ইরান থেকে ভারতের তেল আমদানিতে এখনই কোনও প্রভাব পড়বে না।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"চিত্তশুদ্ধি হলে বোধ হবে, পুরশ্চরণাদি কর্ম তিনিই করান। যাঁর কর্ম সেই করে, লোকে বলে করি আমি।'

"তাঁকে দর্শন হলে সব সংশয় মিটে যায়। তখন অনুকূল হাওয়া বয়। অনুকূল হাওয়া বইলে মাঝি যেমন পাল তুলে দিয়ে হালটি ধরে বসে থাকে আর তামাক খায়, সেইরূপ ভক্ত নিশ্চিন্ত হয়।"

ঈশান চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত একান্তে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নরেন্দ্র, রাখাল, অধর, হাজরা এদের তোমার কিরূপ বোধ হয়, সরল কি না। আর আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মাষ্টার বলিতেছেন, 'আপনি সরল আবার, গভীর, —আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন।

দ্বাদশ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরাকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই **সমাধিস্থ**; কেবল রাখালাদি ভক্তদের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের লইয়া ব্যস্ত—কিসে চৈতন্য হয়।

তাঁহার ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় সকাল বেলা বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ পথে (আগমের পথে) কি তা হয় না? যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, কালী। আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

ঈশান—চণ্ডীর স্তবে আছে, ব্রহ্মাই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মশক্তি অভেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ--এইটি মুখে বললে হয় না, ধারণা যখন হবে তখন ঠিক হবে।

"সাধনার পর চিত্তশুদ্ধি হলে ঠিক বোধ হবে তিনিই কর্তা; তিনিই মন-প্রাণ-বুদ্ধিরূপা। আমরা কেবল যন্ত্রস্বরূপ। 'পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।'

দিনপঞ্জিকা

২৭ বৈশাখ, ভাঃ ২১ বৈশাখ, **১১ মে,** ২৭ বহাগ, সংবৎ ১১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৪ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০৫। **শুক্রবার,** একাদশী রাত্রি ঘ ৮।৩২ মিঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ১০।৩৫ মিঃ। বৈধৃতিযোগ দিবা ঘ ১১।২২ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ৮।১৬ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৩২ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ১০।৩৫ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ দিবা ঘ ১০।৩৫ গতে দোষ নাই, রাত্রি ঘ ৮।৩২ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী— অগ্নিকোণে,** রাত্রি ঘ ৮।৩২ গতে নৈঋর্তে। **বারবেলাদি** ঘ ৮।১৮ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।৪৯ গতে ১০।১২ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১।২২গতে অব্যুঢ়ান্ন দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপন্নরাম্ভ পুন্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধানচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ গোবিক্রয়াদি। **বিবাহ—রাত্রি ঘ ১০।৪১ গতে ২।০১ মধ্যে মকর ও কুম্ভ লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ**— একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **একাদশীর উপবাস (অপরা)। গোস্বামী মতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস। পরম স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমাধমী 'মা'র শুভ আবির্ভাব দিবস** (১২৩তম, ১১ মে)। **জাতীয় প্রযুক্তি দিবস** (১১ মে)। **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৬।০৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩২ গতে ৯।০০ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— রাত্রি ঘ ১।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।০২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৭ বৈশাখ, ভাঃ ২১ বৈশাখ, **১১ মে,** ২৪ শাবান, ২৭ বহাগ উঃ ৫।০১, অঃ ৬।০৩, **শুক্রবার,** একাদশী রা ঘ ৮।৩১ মিঃ, সেহরী শেষ ৩।৩১, ইফ্‌তার ৬।১২।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ভারতীয় সমাজ গঠনে ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার সুফল ও কুফল

তপন কান্তি মুখার্জি
শেষ পর্ব

অর্থনীতির উপরও ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। Max Weber তাঁর 'The Protestant Ethic and the spirit of capitalism' গ্রন্থে ধর্ম কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তা বিশদভাবে দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রোটেস্টান্ট ধর্ম মানুষের মনে এমন এক মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল যা ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদ বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আবার বস্তুগত জীবনের সমৃদ্ধিকে উৎসাহ দেয় না। হিন্দু ধর্ম ও পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির জীবকে অর্থহীন মনে করে।

ধর্মের সুফল যেমন আছে, কুফলও তেমন কিছু কম নয়। ধর্ম সামাজিক ঐক্যর পরিপন্থি। একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর একাত্মবোধ যেমন ধর্ম সৃষ্টি করে তেমনি এই ধর্মবোধ এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ তো ধর্মকে কেন্দ্র করেই। দ্বিতীয়ত অনেক সময় ধর্ম প্রগতি বিরোধিও হয়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার-আচরনেরও পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা এইরূপ পরিবর্তনকে স্বাগত জানায় না। তৃতীয়ত, ধর্ম অদৃষ্টবাদকে প্রশ্রয় দেয়। ধর্ম মানুষের মনে অন্ধ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়। ধর্ম মনে করে মানুষের দুঃখ কষ্ট ঈশ্বরের বিধান। নীরবে এই কষ্ট সহ্য করতে পারলে পরজন্মে স্বর্গ সুখ লাভ করা যায়। এইভাবে ধর্ম মানুষকে প্রতিবাদ বিমুখ, নিস্পৃহ ও নিরুদ্যমী করে তোলে। চতুর্থতঃ, ধর্ম সহনশীল চিন্তা-ভাবনার পরিপন্থি। ধর্ম বিশ্বাসীরা মনে করেন, ধর্ম গ্রন্থের মধ্যেই সমস্ত রকম জ্ঞান, সত্য ও দর্শন নিহিত আছে। এর বাইরে কিছু নেই। তাই সক্রিটিসকে বিষ পান করতে হয়, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থাদি ক্যাথলিকদের নিষিদ্ধ পুস্তক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

যাইহোক শত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ গঠনে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সুষ্ঠু সমাজ গঠনে একমাত্র ধর্মই শেষ কথা হতে পারে না। ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও রাজনৈতিক অনুশাসনও সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা থাকে এবং এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে কেবল শাসন বিভাগকেই বোঝায়। সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় সরকার বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। এই ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় ও স্থায়ী করার জন্য এবং ক্ষমতাকে কর্তৃত্বে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হয় শাসনের। আবার প্রত্যেক রাজনৈতিক দল চায়

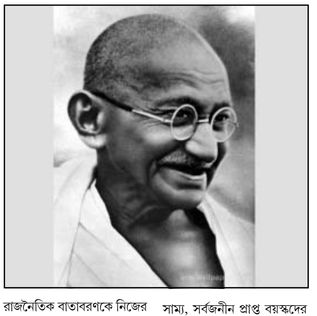

রাজনৈতিক বাতাবরণকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করতে। এজন্যও শাসনের প্রয়োজন।

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হল ভারতীয় সংবিধান। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের লিখিত সংবিধান সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্টগুলিকে একত্রিত করে ভারতীয় সংবিধান তথা শাসনব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে। তাই অনেকের মতে, ভারতীয় সংবিধান হল 'A bag of Borrowings' কিন্তু ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে এই অভিমত সত্যনিষ্ঠ নয়। যাইহোক, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান চালু হয়।

ভারতীয় সংবিধান তথা শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মৌলিক অধিকার। রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, যৌথ নির্বাচন মণ্ডল, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, শক্তিশালী কেন্দ্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সংবিধান রচনা করতে সময় লেগেছে মোট ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন।

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রথম সদর্থক ব্যাপার হল এটি বিশেষ কোনো মতাদর্শের বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রচিত হয়নি। তাই সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হবে এই আশা করাই যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত সংবিধান রচয়িতারা নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও দেশবাসীর সর্বোচ্চ সার্থে ভূমিকা পালন করেছে। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই শাসন ব্যবস্থা ভারত ও ভারতবাসীর সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী হবে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল, সামাজিক, ন্যায় ও সামাজিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান আইন এবং সকলকে মর্যাদা প্রদানের নীতি গৃহীত হয়েছে।

চতুর্থত, সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল এক স্বপ্নের ভারত তৈরি করা। যেখানে দীন-দরিদ্র সাধারণ মানুষও মর্যাদা ভোগ করবেন, কোনো অস্পৃশ্যতার অভিশাপে কাউকে দগ্ধ হতে হবে না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজ করবে। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির উক্তি স্মরণযোগ্য—An India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice...

পঞ্চমত, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার গুণ হল নমনীয়তা। প্রয়োজন বোধ করলে মানুষের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। তাই বিভিন্ন সময়ে জনগণের স্বার্থকে মাথায় রেখে সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় সংবিধান তথা শাসনব্যবস্থার কুফল হল, প্রথমত দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের উপর অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী, রক্ষি বাহিনী, সামরিক বাহিনী তারা সহজেই এবং যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই শাসক শ্রেণির অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং শাসক শ্রেণির অঙ্গুলি হেলনে তাঁরা পরিচালিত হয়। এরফলে শাসনের মাধ্যমে শাস্তির ভয় দেখিয়ে উচিত নয় জেনেও তারা শাসক বিরোধী মানুষজনকে প্রভাবিত করে শাসকদের বসে আনার চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ। তাই ইচ্ছা করলেই নিপিড়ীত গরিব মানুষ সুবিচারের জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে না এবং চায়ও না।

তৃতীয়ত, ভোটব্যাঙ্কের ক্ষতি হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় প্রায় সব দলই সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাই আজও অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তন হতে পারলো না। এখনো মুসলিমদের ক্ষেত্রে শরিয়তি আইনই প্রযোজ্য। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও জাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ নীতি চালু রয়েছে অথচ তা হওয়া উচিত আর্থিক অবস্থা-ভিত্তিক। একজন তথাকথিত উচ্চ বর্ণের মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে না পেলেও তার জন্য কোন সংরক্ষণ নেই। সংরক্ষণ আছে উচ্চ বিত্ত সম্পন্ন তপশিলি জাতি, উপজাতিদের ক্ষেত্রে। পঞ্চমত, পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা হল, ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো। আমাদের শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতিকরাই ধর্মকে ব্যবহার করে, তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০ বছর পরেও ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

তবে, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার কিছু কুফল থাকা সত্ত্বেও সুফলের ভাগই বেশি, কারণ এদেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সংবিধান প্রণীত যুক্তি সংযত আইনা দ্বারা।

উপসংহারে বলা যায়, একটি সমাজের ইতিহাস, তার চিরন্তন, তার জীবনবোধ নিহিত থাকে তার ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার ওপর। ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও এই কথাটি একশো শতাংশ খাঁটি। ভারতীয় সমাজ গঠনে ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু কুফল আছে সত্য, কিন্তু সুফলের দিকেই পাল্লা ভারি। তাই ভারতীয় ধর্ম ও শাসনব্যবস্থা সমাজ গঠনের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

যোজনা ডায়েরি

(২১ নভেম্বর—২০ ডিসেম্বর, ২০১৭)

পর্ব ১১

পশ্চিমবঙ্গ

● **কেন্দ্রের চিকিৎসা-ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্টে ভালো ফল রাজ্যের :**

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যত খরচ হয়, অন্য রাজ্যে গ্রামের সেই খরচটা তুলনায় অনেক বেশি। গোটা দেশের মধ্যে গুজরাতের গ্রামবাসীদেরই চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওই রিপোর্ট। কেন্দ্রের 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অব হেলথ ইন্টেলিজেন্স'-এর ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গুজরাত ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, অসম, মধ্যপ্রদেশের মতো বেশ কিছু রাজ্যের চেয়েই পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালে ভর্তির খরচ কম। অর্থনীতিবিদেরা বলেন, রাতারাতি কোনও মানুষকে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত স্তরে নামিয়ে আনার অন্যতম কারণ হতে পারে চিকিৎসার খরচ।

রিপোর্ট বলছে, সারা দেশের নিরিখে একজন রোগীর হাসপাতালে ভর্তির গড় খরচ গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১৭ হাজার টাকা এবং শহরাঞ্চলে মোটামুটি ২৬ হাজার টাকা। সরাসরি চিকিৎসার খরচ এবং তার আনুষাঙ্গিক খরচ--দু'টিই এর অন্তর্ভুক্ত। গুজরাতে এই খরচ রোগীপিছু ৩২ হাজার টাকারও বেশি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হলে সাড়ে ১০ হাজার টাকার মতো গড়ে খরচ হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের একটি কেন্দ্রীয় রিপোর্ট জানিয়েছে, গ্রামীণ গুজরাতে প্রয়োজনের তুলনায় সার্জেনের ঘাটতি ৯০ শতাংশ, স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের ঘাটতি ৯৫ শতাংশ।

তবে শহরাঞ্চলে চিকিৎসা-খরচ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে একটু হলেও কম গুজরাতে। সেরাজ্যে রোগীপিছু তা প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার টাকা। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি খরচসাপেক্ষ অসম। শহরাঞ্চলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ পশ্চিমবঙ্গ বা গুজরাতের থেকে বেশ অনেকটাই কম কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লিতে।

● **রাজ্য হেরিটেজ তালিকায় রামকৃষ্ণ ঘাট :**

শিকাগো থেকে ফেরার প্রায় এক বছর পরে নৌকায় হাওড়ার একটি গঙ্গার ঘাটে নেমেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত সেই 'রামকৃষ্ণ ঘাট' (অধুনা চিন্তামণি দে ঘাট) এবার স্থান পেল রাজ্যের হেরিটেজের তালিকায়। হাওড়ার স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষ জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করে ওই ঘাটকে হেরিটেজ ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন। কয়েক মাস আগে কমিটি প্রস্তাবটি দেয়। কমিশন সব দিক বিচার-বিবেচনা করে রামকৃষ্ণপুর ঘাটটি হেরিটেজ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য ছিলেন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর লেনের নবগোপাল ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ করেন, তাঁর বাড়িতে গুরুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। সেজন্যই ১৮৯৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমায় ১৫ জন সন্ন্যাসীকে নিয়ে বেলুড় মঠ থেকে নৌকায় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নবগোপালবাবুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ফেরার সময়ে স্বামীজী তাঁর ব্যবহৃত সিল্কের পাগড়ি ও কিছু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য দিয়ে আসেন সেখানে। এখনও প্রতি বছর ওই দিনে বেলুড় মঠ থেকে সন্ন্যাসীরা একইভাবে নবগোপালবাবুর বাড়িতে যান।

● **নামছে নতুন ১৬০-টি সরকারি বাস :**

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ--সর্বত্রই বাড়তি বাস দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকারি সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল এবং কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলিতে আপাতত ১৬০-টি নতুন সরকারি বাস দেওয়া হচ্ছে। ৫০ আসনের প্রতিটি নন-এসি বাসের দাম পড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। এর জন্য টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার।

রাজ্য পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের অধীনে থাকা তিনটি সরকারি সংস্থা পাচ্ছে ১০০-টি বাস। বাকি ৬০-টি বাসের মধ্যে কিছু পাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ আর কিছু যাবে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণে। পরিবহণ নিগমের বাসগুলি চলবে হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনার মধ্যে। কলকাতাতেও কিছু দেওয়া হবে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবরণ নিগমের বাসগুলি চলাচল করবে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া এলাকায়।

অর্থনীতি

➢ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিহ্নিত করা বিপুল পরিমাণ ঋণফেলাপি অ্যাকাউন্টকে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) পাঠাবে ব্যাঙ্কগুলি। যাতে তাদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আগস্টে এরকম ২৮-টি সংস্থার অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া ঋণের প্রায় ১.৪ লক্ষ কোটি টাকার খাতক এরা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ ছিল, হয় ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্থাগুলির অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা মেটাতে হবে, না হলে তাদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এনসিএলটি-তে পাঠাতে হবে। নিয়ম অনুসারে, এনসিএলটি-তে গেলেও অ্যাকাউন্টগুলির ঋণের ৫০ শতাংশ ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে রাখতে হবে।

➢ কালো টাকা লেনদেন প্রতিরোধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে 'অসাংবিধানিক' বলে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি রোহিংটন ফলি নরিম্যান ও বিচারপতি সঞ্জয় কিশন ক'লের বেঞ্চের রায়, ওই আইনের ৪৫ নম্বর ধারায় জামিন পাওয়ার জন্য জোড়া শর্ত চাপানো রয়েছে। আর তাতে জামিন পাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নোট বাতিলের পর থেকে এই 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট'-কেই প্রধান হাতিয়ার করেছিল কেন্দ্র সরকার। যেসব ভুয়ো সংস্থার বিরুদ্ধে কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ বা যাদের হেফাজত থেকে পুরোনো নোট উদ্ধার হয়েছে, তাদের জেলে পুরতেও এই আইনই প্রধান অস্ত্র। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

সুর ও স্বরলিপি করেছিলেন কুমার শচীন দেববর্মন

শচীন দেববর্মন একজন সুরকার ও গায়ক হিসাবেই পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু তিনি গানের স্বরলিপিতেও দক্ষ ছিলেন। এটা আমাদের জানা ছিল না। সেই অজানা কথাগুলি বলে গেছেন রেণুকা ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছেন, কুমার শচীন দেববর্মন গানের স্বরলিপিতেও নিজের ভূমিকা পালন করে গেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ১) এই মহুয়া বনে/মনের হরিণ হারিয়ে গেছে। এই গানেতে তিনি সুরও করেছিলেন ১৯৩৫ সালে। ২) ওরে যাত্রী প্রেম বিনা কে তাহারে পায়/জপমালা বাঁধে নারে প্রেম দেবতায়—এই গানেতে তাঁর সুর ছিল। সালটা ১৯৩৫। ৩) ওরে সুজন নাইয়া/কোন বা কন্যার দেশে যাওরে/চান্দের ডিঙি বাইয়া—এখানেও তিনি সুরকার। একই বছরে করেছিলেন। ৪) কন্ঠে তোমার দুলবে বলে/গানের মালা গাঁথি/তুমি এসে বসবে বলে/ হিয়ায় আসন পাতি। এই গানের সুরে ছিলে বড়কর্তা। এই গান রচনা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ৫) জাগবে সাথী গো জাগিও আমার সাথে/ ঘুমায় না শশী তারা এখন মাধবী রাতে। এখানেও স্বরলিপিতে ছিলেন শচীন দেববর্মন। এইগান রচনা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ৬) প্রভাতে আজ কে এলে গো, রূপ অলঙ্কার/ তিমির দুয়ার খুলে/পূর্ণিমা চাঁদ অস্ত পথে চমকে দাঁড়ায়/ তোমার রূপে ভুলে—সেই বড়কর্তার স্বরলিপি রচনা ১৯৩৫ সালে। ৭) প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে/রয় না বাহিরে/ ফুলের খেলায় চাঁদের খেলায়/ কোথায় পারিরে। ১৯৩৫ সালেই রচনা হয়েছিল। ৮) ফুলের বনে থাকো ভ্রমর/ফুলের মধু খাও/ আমার কথা কন্ঠে লইয়া/বন্ধুর দেশে যাও। রচনা ১৯৩৫ সালেই। ৯) বিদায় দাওগো মোরে/উমা সতী কেঁদে কয়/কাজল মুছিয়া গেল/সিদুর মলিন হয়--এই গানের রচনা ১৯৩৫ সালে। ১০) মধ্য রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয়/ক্লান্ত প্রাণে মম স্নিগ্ধ সুরভি দিও। এই গানও রচনা ১৯৩৫ সালে। প্রতিটি গানের সুরকার ছিলেন কুমার শচীন দেববর্মন। প্রতিটি গানের স্বরলিপিতে তাঁরই ভূমিকা ছিল। এখানে সেই গানের কথাই এসে যাচ্ছে, কারণ গানের মধ্যেই প্রাণের সঞ্চার করে সুর।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

পাঠকের দরবারে

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়